দৈনিক সংবাদ
তারিখ 22 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

শিক্ষায় সংকট

কাজী তামান্না

যখন স্কুলে পড়তাম তখন এই জানুয়ারি মাসটা আমাদের জীবনে দারুণ আনন্দ বয়ে আনতো। এই মাসে নতুন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতাম। নতুন ক্লাসে উত্তরণ মানেই নতুন বই, নতুন খাতা-পেন্সিল— সেকি দারুণ উত্তেজনা। সেই সাথে যাদের ছোট ভাই-বোন স্কুলের নিচু ক্লাসে ভর্তি হতো তাদের আলাদা একটা ভাল লাগা মনকে স্পর্শ করত। ছোট ভাই অথবা বোনকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্তি করে দেয়া, তার উপরে খবরদারি করা— সেই আনন্দের সাথে অন্য কিছুর তুলনা হয় না। আমি খুব বেশিদিন আগের কথা বলছি না। ষাট দশকেও এমন ভাল লাগার ভাগীদার অনেকেই হয়েছে। কিন্তু এই নব্বই দশকে ছবিটা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। এখন যে পরিবারে স্কুল-ভর্তিচ্ছু প্রার্থী থাকে সেই পরিবারের সকলে রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। স্কুলের সবচেয়ে নিচু ক্লাসে ভর্তির জন্য ৫/৬ বছরের শিশুকেও মাসাধিককাল প্রাইভেট টিউটরের কাছে প্রস্তুতি নিতে হয়। গত কয়েক দিনের দৈনিক পত্রিকায় অভিভাবকদের উৎকণ্ঠিত এবং শিশুদের ভয়ে আতঙ্কে মলিন মুখের ছবি দেখে মনে হয়েছে এরা কি কোনদিন লেখাপড়ার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাবে, না কি পীড়নের যাঁতাকলে ধীরে ধীরে যন্ত্রে পরিণত হবে? হায় এখন শিশুদের জীবন থেকে শৈশব মুছে যাচ্ছে। শিশুদের এখন আর শৈশবকাল নেই। একবার বিদ্যালয়ের কারাপ্রাচীরে ঢুকলে অভিভাবকবৃন্দ তাদের সন্তানদের সর্ববিষয়ে প্রথম করার প্রতিযোগিতার ঘোড়দৌড়ে ছুটতে থাকেন। শিশুর কতটুকু গ্রহণক্ষমতা আছে সেদিকে মোটেও দৃষ্টি দেয়া হয় না।

শুধু স্কুলে নয় ভর্তির সমস্যা সর্বত্র। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র। ভাল স্কুলে, ভাল কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা মেডিক্যাল কলেজ কিংবা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া মানে সোনার হরিণের সন্ধান পাওয়া। এখনকার ছাত্রছাত্রীরা আগের তুলনায় অনেক বেশি নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে। দ্বিতীয় বিভাগের চেয়ে প্রথম বিভাগ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। নৈর্ব্যক্তিক প্রথায় পরীক্ষা হওয়ায় এসএসসি'র বহু শিক্ষার্থীই ৭৫ থেকে ৮০ পার্সেন্ট নম্বর পেয়ে পাস করে। তবু একটা ভাল কলেজে অনেকেই ভর্তি হতে পারে না। এইচএসসি পাস করে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ আরও দুরূহ ব্যাপার। বিত্তবান অভিভাবকদের কোন অসুবিধা হয় না। তারা তাদের সন্তানদের পৃথিবীর যে কোন দেশে উচ্চশিক্ষার্থে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু মধ্যবিত্তের তো সেই সাধ্য নেই। সুতরাং তাদের দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ওপরই ভরসা করতে হয়। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় যে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে সক্ষম হয় তারাও যে নির্দিষ্ট সময়ের কোর্স কতদিনে শেষ করবে তার কোন নিশ্চয়তা থাকে না। সেশনজট ছাত্রদের রাজনীতি সন্ত্রাস ধর্মঘট হরতাল শিক্ষার্থীদের জীবনকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

সরকারী নীতি যাই হোক না কেন পৃথিবীর সকল দেশেই সব স্কুল সব কলেজ সব বিশ্ববিদ্যালয় একই মানের হয় না। আমেরিকার সকল বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড বা প্রিন্সটনের সমপর্যায়ের নয়। ইংল্যান্ডের সবগুলো অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজের মত নয়। স্কুল কলেজের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। আমাদের দেশেও অধিকাংশ ভাল স্কুল রাজধানী ঢাকায়। এ ছাড়া কয়েকটি ক্যাডেট কলেজ বিভিন্ন জেলায় আছে যেগুলোতে ছাত্ররা ভর্তির জন্য অধিক আগ্রহ দেখায়। এটা বাস্তব সত্য যে, সব বিদ্যালয়কে একসাথে উন্নতমানের করা সম্ভব নয়। কিন্তু রাজধানীর বাইরে প্রতিটি জেলায় কিছু আদর্শ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা উচিত। গ্রামাঞ্চলে অনেক উজ্জ্বল ছেলেমেয়ে আছে। কিন্তু হয়ত তাদের পরিবারের তেমন সামর্থ্য নেই ভাল স্কুলে পাঠানোর। সুতরাং জেলার ভেতরে ভাল স্কুলের সংস্থান থাকা চাই। তা না হলে সম্ভাবনাময় বহু ছাত্রছাত্রী অর্থের অভাবে অকালে ঝরে পড়ে এবং এটাই এখন আমাদের দেশে অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। স্কুল কলেজের শিক্ষাটা ক্রমশ বিত্তবানের সন্তানদের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ছে। পূর্বে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুল থেকেও শিক্ষার্থীরা ভাল রেজাল্ট করত। কিন্তু এখন দেখা আছে রাজধানীর কিছু বিদ্যালয় ও ক্যাডেট কলেজগুলোতে মেধাবী ছাত্রদের তালিকা সীমাবদ্ধ থাকে। তাই হঠাৎ করে গ্রামাঞ্চলের কোন অসাধারণ মেধাবী ছাত্রের সন্ধান পেলে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই।

এখানে আরেকটি বিষয়ে কিছু না বললে শিক্ষাক্ষেত্রের আলোচনাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেটা হল ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক। কিছুদিন আগেও শিক্ষকরা দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের সুশিক্ষার পথকে প্রশস্ত করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু বর্তমানে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গড়ে উঠছে। এটা ঠিক বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা এর জন্য দায়ী। তবুও মাতৃত্বের যেমন, শিক্ষালয়ের তেমনি একটি আদর্শ রূপ আছে। শিক্ষকের সমস্ত সীমাবদ্ধতা নিয়েও সেই কথাটা মনে রাখা উচিত। অনেক সময় বাবা-মার চেয়েও শিক্ষকের প্রভাব ছাত্রের উপর অনেক বেশি পড়ে। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যদি সুন্দর সম্পর্ক না থাকে তবে ছাত্র তার অনুশীলনের মধ্যে কখনোই আনন্দ খুঁজে পাবে না। অনুশীলন ও আনন্দের মধ্যে যদি যোগসূত্র না থাকে তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার আদর্শ কখনোই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এই ব্যাপারটাই এখন আমাদের দেশে ঘটছে। শিক্ষা ক্রমশ যান্ত্রিকতায় রূপ নিচ্ছে। ছাত্রদের প্রবণতা হল কত কম জেনে কত ভাল ফল লাভ করা যায়। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার শিক্ষকরাও এতে ইন্ধন যোগাচ্ছেন। অথচ বিদ্যালয়েই শিশুর ব্যক্তিত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এক অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশি।

উচ্চশিক্ষার মাধ্যম কি হবে সেই নিয়ে আজকাল প্রশ্ন উঠেছে। যদিও আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা তবু উচ্চশিক্ষার জন্য সেই পরিমাণে বই অনূদিত হয়নি। সুতরাং ইংরেজি ভাষার উপর ছাত্রদের নির্ভর করতে হয়। কিন্তু মুস্কিল হলো এই যে ভাষা শিক্ষা ব্যাপারটাই আমাদের দেশে অবহেলিত। শুধু ইংরেজি নয় মাতৃভাষাও ছাত্রছাত্রীরা ভালোভাবে শিখছে না। ভাষাশিক্ষার মান কি করে উন্নত করা যায় সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। উপরন্তু নৈর্ব্যক্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাষাশিক্ষার মান আরও নিচে নেমে গেছে। পাঠ্য বিষয়ে ভাষাশিক্ষা আছে বটে কিন্তু ছাত্ররা সে বিষয়ে বড়ই উদাসীন। অথচ ভাষা বিষয়টা শ্রদ্ধার সাথে শেখা উচিত। কারণ ভাষার ভিতর দিয়েই ছাত্রদের আত্মপ্রকাশের শক্তি বিকশিত হয়। আরেকটি ব্যাপার যা আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রধান অন্তরায় তাহলো মুখস্থ বিদ্যা। অধিকাংশ ছাত্রই পরীক্ষা পাসের জন্য মুখস্থবিদ্যার উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চমৎকার কথা বলেছেন-"ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে হইবে, নতুবা সে ছেলেই থাকিবে মানুষ হইবে না। শিশুকাল হইতে কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া সঙ্গে সঙ্গে যথা পরিমাণে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর দিতে হইবে।"

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার থাকা উচিত। তাহলো এ ক্ষেত্রে শিক্ষার মান উঁচু রাখা একান্ত আবশ্যক। এটা শুধু আদর্শের কথা নয়। বাস্তব প্রয়োজনের কথা। উচ্চশিক্ষার ভেতর দিয়ে তৈরি হয় দক্ষ শিক্ষক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিজ্ঞানী। কিন্তু তা না হয়ে যদি অপটু ইঞ্জিনিয়ার, অযোগ্য ডাক্তার, নিম্নমানের শিক্ষক ও বিজ্ঞানী বেরিয়ে আসে তবে সমস্ত সমাজের তাতে বিপদ। বিপন্ন আমাদের ভবিষ্যৎ। তাই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার মান উঁচু রেখে যত অধিক সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী নেওয়া আমাদের সাধ্যায়ত্ত ততটাই নেয়া উচিত। তার বেশি নয়। সব ছাত্রেরই স্বাভাবিক ঝোঁক একদিকে যায় না— অনেকের আগ্রহ ও দক্ষতা থাকে শিল্পে, সঙ্গীতে, কারো বা কারিগরি শিক্ষায়, কারও সমাজসেবায়। মনুষ্যত্বের বিকাশের বিচারে এর কোনটাকেই ছোট করে দেখা উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সীমাবদ্ধ এটা অবশ্যই মেনে নিতে হবে। আরেকটা কথা আমাদের মেনে নিতে হবে। নিছক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ অথবা জীবিকার জন্য শিক্ষা এক বস্তু আর বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানচর্চা অন্য বস্তু। জীবিকার প্রয়োজন প্রশ্নাতীত এবং অত্যন্ত জরুরী— দুয়ের ভেতর একটা সম্পর্ক আছে বটে কিন্তু দুটোকে এক করতে গেলে অনেক সময় দুয়েরই ক্ষতির সম্ভাবনা। আমাদের দেশে বরাবরই আমরা এই ক্ষতি করে আসছি। উঁচু ধাপে যে ছাত্রদের স্বভাবিক ঝোঁক গবেষণা ও তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের দিকে তাদের আমরা ধরে রাখতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন-"আমাদের দেশে যে জ্ঞানী গুণী ক্ষমতাসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করেন না তাহা নয়-কিন্তু তাহাদের জ্ঞানগুণ ও ক্ষমতা ধরিয়া রাখিবার কোন ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। তাহারা চাকরি করেন, ব্যবসা করেন, রোজগার করেন, পরের হুকুম মানিয়া চলেন, তাহার পরে পেনশন লইয়া ভাবিয়া পান না কেমন করিয়া দিন কাটিবে। এমন প্রত্যহ কত রাশি রাশি সামর্থ্য দেশের উপর দিয়া গড়াইয়া বহিয়া উবিয়া চলিয়া যাইতেছে।"

আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীরা সত্যি অভাগা। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ এই বাংলাদেশের ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে প্রধানত দেশের ক্ষমতাবানদের হাতে। শিক্ষার একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। সেই মূল্যে যারা বিশ্বাসী তাদের কথাটা যদি অনুচ্চারিত থাকে, সংগঠিত না হয় তবে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সমগ্র সমাজ। এ ক্ষেত্রে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন শিক্ষক সমাজ। আমরা অনেক সময় বলে থাকি সমাজে যখন এত অন্যায়, অবিচার তখন শিক্ষকের কাছ থেকে আদর্শের নামে কিছু আশা করা যায় না। তবু আমাদের যা কিছু ব্যর্থতা তার জন্য সমাজকে দায়ী করেও আমরা কি বিবেকের কাছে দায়মুক্ত হতে পারবো? আজও অনেক শিক্ষক আছেন যারা সম্মানের যোগ্য। যারা মনে করেন এই নোংরা ভরা পঙ্কিল সমাজে শিশুরা জন্মগ্রহণ করে চোখে আশার আলো নিয়ে। তাই যারা সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও ভবিষ্যৎ পৃথিবী গড়বার জন্য মানুষ গড়ার মহান ব্রত থেকে বিচ্যুত হন না তারাইতো যথার্থ শিক্ষক। তাদেরই হাতে একদিন এদেশের শিক্ষা সমস্যার সমাধান হবে। সেই অনাগত ভবিষ্যতের জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকবো।